গোয়ার মুক্তি সংগ্রাম প্রসঙ্গে

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৪৫১ বছরের পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে গোয়ায়। মাত্র দু দিনের সামরিক অভিযান ভারতের বুকে শেষ উপনিবেশের পতন ঘটায়। তবে এই স্বল্পকালীন যুদ্ধই গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। এর পেছনে রয়েছে বছরের পর বছর ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের উজ্জ্বল ইতিহাস। এই সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে কখনও অহিংস সত্যাগ্রহের আকারে, কখনও সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী পথে। দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনে গোয়ার অধিবাসীরা অসম সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী বহু ব্যক্তিত্ব গোয়ার মুক্তি সংগ্রামে নিজেদের শরিক করেছেন, সংহতি জানিয়েছেন। গোয়ার মুক্তি অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষটি অতিক্রান্ত হয়ে গেল প্রায় নীরবে। সুন্দরী গোয়ার বীরগাথার টুকরো ছবি মেলে ধরার প্রয়াসেই এই রচনাটির অবতারণা।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে আল বুকের্ক বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানদের কাছ থেকে গোয়া জয় করে নিলেন। সেই থেকেই গোয়ায় পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত। তবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই গোয়াবাসীরা পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তখন থেকে শুরু করে পরবর্তী চারশো বছরের

বেশি সময় ধরে বারবার গোয়াতে এই ধরণের বিদ্রোহ ঘটে। এমনকি পর্তুগীজ পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরেও গোয়াবাসীরা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। সব মিলিয়ে পর্তুগিজ কবল থেকে গোয়াকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গোয়ার সংগ্রামী জনগণ চল্লিশটি বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিলেন।

বিস্তৃত ভারত ভূখন্ডে ব্রিটিশ উপনিবেশের পাশাপাশি কিছু কিছু এলাকায় ছিল ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগিজ উপনিবেশ। আর ছিল ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্বীকার করে নেওয়া স্বাধীন রাজা ও নবাবদের কয়েকটি করদ রাজ্য। দোর্দন্ডপ্রতাপশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ছিল এদের সহাবস্থান। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জনের পরে যাবতীয় ফরাসী ও ওলন্দাজ উপনিবেশগুলি এবং করদ রাজ্যগুলি মুক্তি অর্জন করে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে গোয়ায়। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পরে দীর্ঘ চোদ্দ বছর পরে পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণ থেকে গোয়ার মুক্তি ঘটে এবং পুনরায় ভারতভুক্তি ঘটে। চোদ্দ বছরের বিলম্বিত কালপর্বে সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির কূটকৌশল চলে গোয়াকে ঘিরে। আর এই সাম্রাজ্যবাদী কূটকচালিকে আড়াল করার জন্য অবতারণা করা হয় অদ্ভুত যুক্তির। বলা হয়, ভৌগোলিক দিক থেকে গোয়া একদা ভারতের অন্তর্গত থাকলেও পর্তুগিজরা সাড়ে চারশো বছর ধরে সেখানে থাকার ফলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের মাধ্যমে গোয়া একটি আধা পর্তুগিজ ক্যাথলিক দেশে পরিণত হয়ে গেছে। তাই গোয়ার অধিবাসীদের পক্ষে আর পর্তুগীজ সত্তার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে মিলে যাওয়া সম্ভব নয়। এ প্রশ্নে তাদের আগ্রহও নাকি কম। গোয়াবাসীরা নিজেদের পর্তুগিজদের বেশি কাছাকাছি বলে মনে করে এবং ভারতের চাইতে পর্তুগালের সঙ্গেই তারা বেশি একাত্মতা বোধ করে। পর্তুগাল সরকারের পক্ষ থেকে গোয়ার উপর থেকে নিজেদের দখল না ছাড়ার পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিল এইটাই। পর্তুগাল সরকারের এই যুক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করে নিজস্ব ব্যাখ্যা হাজির করেন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক টয়েনবি। তিনি তাঁর 'A Study of History' গ্রন্থে বলেন যে, খ্রীষ্টীয় ক্যাথলিক ধর্মের আধ্যাত্মিক বন্ধন হয়তো শেষ পর্য্যন্ত ভারতের সঙ্গে গোয়ার অধিবাসীদের ভৌগোলিক সম্পর্ক বা জাতিগত রক্তের সম্পর্কের চেয়ে বাস্তবে বেশি শক্তিশালী হয়ে দেখা দেবে। সেই ধর্মীয় আধ্যাত্মিক বন্ধনেই ব্রিটিশ শাসন মুক্ত বিশাল ভারতের সর্বগ্রাসী আকর্ষণ উপেক্ষা করে গোয়াকে পর্তুগালের সঙ্গেই বহাল রাখবে।

ঐতিহাসিক টয়েনবি-র মতের যে ঐতিহাসিক সত্যতা ছিল না তার প্রমাণ ব্রাজিল। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ব্রাজিল পর্তুগালের উপনিবেশ। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তারা পর্তুগালের অধীনে ছিল। গোয়াবাসীদের চাইতে ব্রাজিলের অধিবাসীদের সঙ্গে পর্তুগালের রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। তথাপি ব্রাজিল রাষ্ট্রীয় দিক থেকে, পর্তুগালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারল না বা চাইল না। এই ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে টয়েনবি-র বইয়ে কোনও উল্লেখ নেই।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে গোয়ার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার দুই অগ্রণী ব্যক্তি ফ্রান্সিসকো লুইস গোমেজ ও ত্রিস্তাঁও ব্রাগাঞ্জা কুন্যা দুইজনই গোয়ার সুপ্রাচীন রোমান ক্যাথলিক বংশোদ্ভুত ছিলেন। গোয়াতে পর্তুগাল শাসনের বিরুদ্ধে আধুনিক যুগে প্রথম যে বিদ্রোহ হয়, যাকে বলা হয়, Pinto's Rebellion বা Priests' Rebellion, তার নেতা ও প্রধান দুই উদ্যোক্তা পঞ্জিমের ফাদার ফ্রান্সিসকো কুতো এবং দিভারের ফাদার আন্তনিও গন্‌সালভেস —এই দুইজনেই ছিলেন গোয়াবাসী ক্যাথলিক ধর্মযাজক। তাঁদের ধর্মীয় পরিচিতি ও সত্তা জাতীয়তাবাদী সত্তাকে গ্রাস করে নি। এইখানেই টয়েনবি-র যুক্তির অসারতা।

গোয়ার মুক্তিসাধন তথা ভারতভুক্তির প্রশ্নে দীর্ঘসূত্রীতার রহস্য লুকিয়ে আছে পার্থিব সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে। পুরানো ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে এক্ষেত্রে মেলবন্ধন ঘটেছে পর্তুগালের সমসাময়িক স্বৈরশাসক ডঃ সালাজারের অতি-রক্ষণশীল ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের। ১৯২৭-২৮ সালে পর্তুগালের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কোইম্ব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ আন্তেনিও দে অলিভেইরা সালাজার পর্তুগিজ সাধারণতন্ত্রের তৎকালীন সামরিক শাসকদের আমন্ত্রণে আর্থিক বিপর্যয় থেকে পর্তুগালকে বাঁচানোর লক্ষ্যে প্রথমে অর্থসচিব ও পরে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট কারমোনার

পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পর্তুগালের ধনিক-বণিক-ভূস্বামী সম্প্রদায়, অভিজাত শ্রেণী ও রক্ষণশীল সামরিক অফিসার গোষ্ঠীর সমর্থনে তিনি ক্রমান্বয়ে পর্তুগালে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতার বাহন হয়ে ওঠে তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' বা ন্যাশানাল ইউনিয়ন দল। ফ্যাসিস্ট নায়ক মুসোলিনীর মতো তিনিও ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ভেঙ্গে দিলেন, বন্ধ করে দিলেন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। ফতোয়া দিলেন শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী পরিচয়ের কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র শাসক দলের নেতৃত্বে ধনিক-শ্রমিক, ভূস্বামী-কৃষক, ব্যবসায়ী-কারিগর সবাইকে জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে কাজ করতে হবে। তাঁর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার নাম দিলেন 'ইস্তাদু নুভো' (Estodo Novo বা New State)। আর ফ্যাসিস্ট নায়ক নাৎসি হিটলারের 'গেষ্টাপো' এবং 'ঝটিকা বাহিনীর' অনুকরণে গড়ে তোলেন 'পিদে' বাহিনী (PIDE - Policia International de Defesa de Estado) ! হিটলারের পুলিশ কর্তা হিমলারের পরামর্শ মতো তিনি এই 'পিদে' বাহিনীকে 'গেস্টাপো' সংগঠনের কায়দায় ঢেলে সাজান। পোল্যান্ডে পিল্‌সুডস্কি, ইতালিতে মুসোলিনী, জার্মানীতে হিটলার, স্পেনে ফ্রাঙ্কো এবং পর্তুগালে সালাজার— সকলেই একই পথের পথিক, একই ধরণের ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের প্রতিভূ বা প্রতিনিধি।

পিল্‌সুড্‌স্কি, মুসোলিনী, হিটলার সকলেই একে একে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কেবল দীর্ঘ সময় ধরে স্বৈরশাসনকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন স্পেনের ফ্রাঙ্কো এবং পর্তুগালের সালাজার। খুবই ছোট ও দরিদ্র দেশ পর্তুগাল ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তিগুলির মধ্যে অতিশয় নগণ্য ও দুর্বল শক্তি হলেও সকলের অলক্ষ্যে কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সেজে, কখনও হিটলার-মুসোলিনীর অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে, আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে মার্কিন সমর্থন ও মুরুব্বিয়ানার জোরে সালাজার একাধারে পর্তুগালে তাঁর স্বৈরশাসন ও পর্তুগালের বাইরে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন। কেবলমাত্র ক্যাথলিক ধর্মীয় চেতনার উপর নির্ভর করে নয়।

এই সুলুকসন্ধানী রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত সালাজারের হাত ধরে পর্তুগাল ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি মারফৎ ন্যাটো জোটের অন্তর্ভুক্ত মিত্ররাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে বহাল রাখে। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শক্তির লড়াইয়ে অথবা কমিউনিজমের বিপদের মুখে তথাকথিত 'স্বাধীন' বিশ্বের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারক বাহক হয়ে ওঠে। পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে তৎকালীন পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলির জনসাধারণের কাছে রেডিও মারফৎ তথাকথিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করার 'মহৎ' কাজে নিযুক্ত 'রেডিও ফ্রি ইউরোপ' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় ছিল তার সদর দপ্তর ছিল সালাজার শাসিত পর্তুগালের লিস্‌বনে। অথচ বিশ্বজুড়ে তথাকথিত স্বাধীন ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী এই সালাজার ক্ষমতায় আসার পরেই ঘোষণা করেছিলেন— We are anti parliamentary, anti-democratic, anti liberal (আমরা সংসদীয় ব্যবস্থার বিরোধী, গণতন্ত্রের বিরোধী, সর্বপ্রকার উদার নীতির বিরোধী)। 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' দল বা সালাজারের বিরুদ্ধবাদীদের পর্তুগালের রাজনীতিতে কোনও স্থান নেই। তাদের স্থান হয় জেলের ভিতর অথবা দেশের বাইরে নির্বাসনে।

এহেন স্বৈরশাসক ধুরন্ধর সালাজার তাঁর ঘুনধরা একনায়কত্বকে টিকিয়ে রেখেছিলেন 'ন্যাটো' চুক্তি ও মার্কিন সাহায্যের দৌলতে। আবার ইউরোপে 'গণতন্ত্র' বাঁচানোর সংগ্রামে সালাজারের পর্তুগালের সাহায্য পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। আগে গ্রেট ব্রিটেনের, পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার পর্তুগালের স্বার্থ রক্ষায় গোয়া প্রশ্নে মার্কিন কর্তারা যতটা সম্ভব পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করলেন। ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডালেস পর্তুগালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাউলো কুন্যার সঙ্গে যুক্ত বিবৃতি দিয়ে গোয়াকে পর্তুগালের অন্তর্গত প্রদেশ বলে ঘোষণা করতে এবং ভারত জোর করে যাতে গোয়া দখল করার চেষ্টা না করে সেই মর্মে ভারতের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে দ্বিধা করলেন না। সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীস্বার্থের জন্য কি নির্লজ্জ নগ্ন ভূমিকা !

অন্ধকার চিরস্থায়ী হয় না। তাই পর্তুগালের অভ্যন্তরে সালাজারের একনায়কত্বের অচলায়তনে ক্রমশ ফাটলের চিহ্ন প্রকট হতে থাকে। সালাজার এবং 'পিদে'র দমননীতির বিরুদ্ধে দরিদ্র শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, বাগিচা শ্রমিক, মৎস্যজীবীদের মধ্যে

ক্রমশ বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের মধ্যেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। কারণ তাঁরাও দমন পীড়ন থেকে বাদ যান নি। জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা দেয় ১৯৫৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। বিদেশী দলের রাজনীতিকদের সঙ্গে ধর্মযাজকরা একসঙ্গে ইস্তেহার জারি করে সালাজারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের দাবী জানান। দেশের অভ্যন্তরে এই সঙ্কটাপন্ন আর্থসামাজিক অবস্থায় আর গোয়াতে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের মুখের দিকে তাকিয়ে সাধারণ গোয়াবাসী ও গোয়া-মুক্তিকামী ভারতীয় স্বেচ্ছা সৈনিকের দল গোয়ায় মুক্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে বিপুল মূল্য দিয়েছিলেন, পর্তুগিজ সৈন্য ও পুলিশের বুলেটে তথা অমানুষিক অত্যাচারে প্রাণ দিলেন, জেলে বন্দী অবস্থায় অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করলেন তা বিফলে গেল না। ভারত রাষ্ট্রের পরিচালকরা গোয়াকে পর্তুগিজ দখল থেকে মুক্ত করতে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করে এবং দুনিয়াজুড়ে মার্কিন প্রভাবিত জনমতকে তোয়াক্কা না করেই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অভিযান সংগঠিত হল। এই সাহসিকতা ভারতের নেতারা সেদিন দেখাতে পেরেছিলেন নির্জোট আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকার জোরে ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বরাভয়ে। আজকের দিনে এই দৃষ্টান্ত দেখানো একটি সুদূরপরাহত চিন্তা।

মুক্ত হল গোয়া। ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ গোয়া আবার দীর্ঘ সাড়ে চারশো বছরের ব্যবধানে অন্তর্ভুক্ত হল ভারত ভূখন্ডের সাথে। অবসান হল এক দীর্ঘ সংগ্রামের।

(ঋণস্বীকার ঃ সালাজারের জেলে উনিশ মাস— ত্রিদিব চৌধুরী)